জঙ্গলমহলে শুধু ভরণ-পোষণ নয়, চাই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনও

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আশির দশকের মাঝামাঝি, বছর তিনেকের জন্য আমি মেদিনীপুরের বাসিন্দা ছিলাম চাকরিসূত্রে, তখনও কিন্তু জঙ্গলমহল নামটার পত্তন ঘটেনি। ঝাড়গ্রাম শহরের প্রবেশপথের ধারে 'জঙ্গলমহল' লেখা একটি বোর্ড টাঙানো ছিল যা দেখে অনুমান করতাম এখানে এই নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। তখন ক্রমশ দানা বাঁধছিল ঝাড়খন্ড আন্দোলন যা ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে। একদিন জিপ নিয়ে কেশিয়ারি যাওয়ার পথে জনা চল্লিশেক সশস্ত্র আদিবাসী যুবক আমার জিপ ঘিরে তুমুল শ্লোগান দিতে শুরু করে, 'ষোলো জেলার মুক্তি চাই', আশঙ্ক করেছিলাম হয়তো মহকুমাশাসককে একা পথের মধ্যে পেয়ে আক্রমণ করবে, কিন্তু সম্ভবত আমার শীর্ণকায় চেহারা দেখে রেহাই দিয়ে তারা চলে যায় তির-ধনুক, বল্লম ইত্যাদি উঁচিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে।

কিন্তু তাদের ক্রোধ তীব্র হয়েছিল ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসকের অফিসে। হাজারদুয়েক আদিবাসী অস্ত্র উঁচিয়ে মিছিল করে এসেছিল প্রতিবাদ জানাতে। মহকুমাশাসক আগাম খবর পেয়ে 'মেদিনীপুর জেলাশাসকের অফিসে কাজ আছে' বলে চলে যাওয়ায় ঝাড়খণ্ডিদের ক্রোধ আছড়ে পড়েছিল মহকুমাশাসকের অফিসের উপর, ক্রোধ নিবারিত হয়েছিল তাঁর চেম্বারের টেবিলের কাচ ও বেশ কিছু টেলিফোন ভাঙচুর করার পর।

কিন্তু আদিবাসীরা কি সত্যিই এরকম দুর্বিনীত, ক্রুদ্ধ স্বভাবের! মাত্র কয়েক দশক আগে পিছিয়ে গেলেই আমরা জানব তাদের আদত চেহারা মোটেই এমনটি নয়। বরং তারা খুবই নম্র, বিনয়ী, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল তাদের জীবন। তারা যতটা না দুবেলা পেট পুরে খাওয়ায় আগ্রহী, তার চেয়েও পছন্দ করে নাচগান করে হুল্লোড় করতে। কোনও আদিবাসী গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উৎসাহী পথিক শুনতে পাবেন মাদল ও ধামসার গম্ভীর আওয়াজ, বাঁশির সুর, সেই সঙ্গে নাচের তালে তালে গাওয়া এক বিচিত্র সুরের গান। সেই গানের মধ্যে তারা ফুটিয়ে তোলে তাদের জীবনবোধ, তাদের প্রাণপ্রাচুর্য।

আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই এ-দেশে বেশি। তাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাদের গান ও কবিতার মাধ্যমে। সত্তর দশকের প্রথমদিকে সাঁওতালী ভাষায় কিন্তু রোমান হরফে লেখা কিছু গান ও কবিতার খাতা পৌঁছেছিল আমার হাতে যেগুলির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ। শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য নামে এই সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন পেশাগতভাবে আমার অগ্রজ, তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচিত্র নেশার শরিক হয়ে আমি শুরু করেছিলাম গানগুলির বাংলা অনুবাদ। আমাকে সাহায্য করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এমন বহু প্রথিতযশা কবি।

সেই লেখাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুবাদে আমি অনুভব করেছিলাম এই আদিবাসী মানুষগুলিকে আমরা তেমন আমল দিই না ঠিকই, কিন্তু তাদের জীবন দর্শন, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, প্রেমের তীব্রতা ইত্যাদি যথেষ্ট সমীহ করার মতো। তাদের গানের কথা, শব্দ-

ব্যবহার, লিরিক— সবই অতি উচ্চমানের। এ কথা ভাবতে দ্বিধা নেই যে, যাঁরা এই গান ও কবিতাগুলির স্রষ্টা তাঁরা প্রায় সবাই নিরক্ষর, অর্ধাহারে-অনাহারে কাটে তাদের দুঃখী জীবন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই এক অনন্য জীবনবোধের অধিকারী, কখনও দার্শনিকও।

তারও এক দশক পরে চাকুরির নিয়মানুযায়ী আমাকে যোগ দিতে হয় মেদিনীপুর-দক্ষিণের (বর্তমানে খড়্গপুর মহকুমা) মহকুমাশাসক হিসেবে। সেই এলাকার একটি বড়ো অংশে আদিবাসীদের বসবাস, ফলে তাঁদের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ মিলন ও আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হয়নি। অচিরেই তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যও স্থাপিত হল প্রধানত দুটি কারণে:

প্রথমত, একদিন কয়েকজন আদিবাসী আমার চেম্বারে ঢুকে জানালেন তাঁরা দু-ঘণ্টা আগে স্লিপ দিয়ে বসে আছেন, কিন্তু এমন সময়ে ডাক পেলেন যখন তাঁদের ঘরে ফেরার লাস্ট বাস ছেড়ে গেছে মেদিনীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে। তাঁরা আজ রাতে ঘরে ফিরতে পারবেন না।

মহকুমাশাসকের সঙ্গে দেখা করার এত ঝকমারি তা আমারও জানা ছিল না। খবর নিয়ে জানলাম আমার আর্দালি এভাবেই তাদের দিয়ে স্লিপ লিখিয়ে বসিয়ে রাখে এক-দেড় ঘণ্টা যাতে প্রমাণ করা যায় এসডিও-র দাপট কতখানি। অতএব পরদিন থেকে স্লিপ সিস্টেম তুলে দিয়ে মহকুমাশাসকের চেম্বারকে ঘোষণা করে দিলাম এক অবারিত স্থান হিসেবে, যাঁর যখনই প্রয়োজন হবে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়বেন ভিতরে।

দ্বিতীয়ত, একদিন খবর পেলাম আদিবাসী মানুষজন যখন তফসিলি উপজাতি শংসাপত্র নিতে আসেন তাঁদের অবেদন তদন্ত করার নামে যথেচ্ছভাবে ঘোরানো হয়, কখনও ছ-মাস বা এক বছরও লেগে যায় শংসাপত্র হাতে পেতে। এমনকি আমার অফিসের যিনি শংসাপত্র তৈরির দায়িত্বে তাঁকে শংসাপত্রপিছু ষাট টাকা না দিলে সেটি মহকুমাশাসকের ঘরে স্বাক্ষরের জন্য পাঠনোই হয় না। সেদিনই সেই সহায়ককে অন্যত্র বদলি করে দিয়ে অন্য সহায়কের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে বলে দিয়েছিলাম আদিবাসীদের পদবি, অবয়বের গঠন ও মুখের ভাষা অনুসরণ করলেই তো বোঝা যায় তাঁরা আদিবাসী কি না। তাঁদের আবেদন পাওয়ামাত্র দু-দিনের মধ্যে শংসাপত্র তৈরি করে পাঠাতে হবে আমার ঘরে। আমি তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ভাষায় কথা বলে স্বাক্ষর করব শংসাপত্রে।

মাত্র দুটি পদক্ষেপেই আমি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস অর্জন করি, ও পরের তিন বছর আমি হয়ে উঠি তাঁদের একান্ত আপনজন। সারা মেদিনীপুর জেলায় যেখানে যত আদিবাসী উৎসব অনুষ্ঠিত হত সর্বত্রই ছিল আমার আমন্ত্রণ। তাঁদের এলাকায় গেলে যেভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা জানাতেন, আপ্যায়ন করতেন তাঁদের ঘরে সামান্য যা কিছু আছে তাই দিয়ে তা আমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল মানুষকে একটু ভালোবাসলেই তার বিনিময়ে বহুগুণ ভালোবাসা ফেরত পাওয়া যায়।

মনে পড়ে একবার নয়াগ্রামের আমজাম গ্রামে পৌঁছে তাদের নাচগান দেখতে দেখতে মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিল। অত রাতে মেদিনীপুরে ফেরা ঝুঁকি হয়ে যাবে বলে তাঁরা গ্রামের এক বাড়িতে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের ঘরের রান্না আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত, তেমন সুস্বাদুও নয়, কিন্তু তাঁদের ঘরের মেয়ে-বউদের আন্তরিকতা

মেশানো সেই আহার্য মনে হয়েছিল খুবই চমৎকার। চালাঘরের বারান্দায় রাত কাটানোর সেই অভিজ্ঞতা আজও মনে হয় অতুলনীয়। পরে জেনেছিলাম এ সব জায়গায় ঘরে-ঘরে কুষ্ঠ ও টিবি-র আড়ত, তাতে একটু অস্বস্তি যে হয়নি তা নয়, কিন্তু দেখেছিলাম তাদের অন্তরে ভালোবাসার কোনও কমতি ছিল না।

আরও একবার মনে পড়ে গোয়ালতোড়ের এক উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে সন্ধের পর মাঠের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই গাঁয়ে যাওয়ার রাস্তা। জমির আল বরাবর যেতে গিয়ে জিপ হোঁচট খাচ্ছে বারবার। রাত বাড়ছে ক্রমশ। সেই বিপুল অন্ধকারে তখন কাতারে কাতারে আদিবাসীরা চলেছেন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অধিকাংশেরই জীর্ণদীর্ণ চেহারা, বউ-ছেলেমেয়ে-আত্মীয়পরিজন নিয়ে পরবে যাওয়ার কী উৎসাহ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি হ্যাজাকের আলো। মাদল ও ধামসার দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ। কিন্তু এমন রাস্তা যে হয়তো পৌঁছতেই পারব না এই রাতে। আমাদের দুর্দশা দেখে আদিবাসী মানুষজন হই হই করে আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন গন্তব্যে।

আর একবার খড়্গপুর শহরের অদূরে হিরাঝিল গ্রামে গিয়েছি তির-ধনুকের প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করতে। মঞ্চে আসীন হয়েছি, সেসময় দশ-বারোটি কিশোরী ও বালিকা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে মঞ্চে উঠে এল আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। কারও হাতের থালায় একগুচ্ছ জ্বলন্ত প্রদীপ, কারও হাতের থালায় সরষের তেল ভর্তি বাটি, কারও হাতে জলপূর্ণ ঘটি। তারা প্রথমে একদফা নাচ করে মঞ্চের মাঝখানে, অতঃপর একজন তার প্রদীপভর্তি থালা নিয়ে আমাকে অর্চনা করে, পরের জন বাটির তেল মাখিয়ে দিল আমার দুটি পায়ে। খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু আমার নিষেধ না মেনে তার পরের জন তার ঘটির জল দিয়ে ধুইয়ে দিল পা, তার পরের জন যখন তার মাথার লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গেল আমার পা, কুণ্ঠাবশত আমি পা সরিয়ে নিতে যাচ্ছি— তখন আদিবাসী গ্রামপ্রধান বললেন, আপনি আপত্তি করবেন না, এটাই আমাদের অতিথি আপ্যায়নের প্রথা।

মাত্র তিন বছরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তাতে উপলব্ধি করেছিলাম আদিবাসীরা খুবই চমৎকার মানুষ, অতি সহজ-সরল, তাঁরা চান মানুষের কাছে একটুকরো ভালোবাসা। কিন্তু অনাদিকাল থেকে আমরা যারা নিজেদের সভ্য মানুষ বলে দাবি করি তাঁরা সর্বদাই আদিবাসী মানুষদের দ্বিতীয়ও নয়, তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে স্থান দিয়েছি আমাদের সমাজে। মনে পড়ছে একদিন এক বয়স্ক মানুষকে আমার চেম্বারে ঠায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দেখে তাঁকে চেয়ারে বসতে বলেছিলাম, তিনি তো কিছুতেই বসবেন না, শেষে আমার চাপাচাপিতে চেয়ারে বসে বলেছিলেন, 'জীবনে এই প্রথম কোনও এসডিও-র ঘরে বসতে পেলাম।' তখন তাঁর মুখে এক অপার্থিব হাসি। তবে এখন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আদিবাসীরা তাদের দাবি পেশ করতে শিখেছে উঁচু গলায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের অধিকাংশ 'সভ্য' মানুষ আজও এই আদিবাসীদের কাছের মানুষ বলে ভাবতে পারে না। চেয়ারে বসতে বলা দূরে থাকুক, ঘরে ঢোকার

অধিকারটুকুও দেওয়া হয় না তাদের। বরং তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে তাদের জন্য বরাদ্দ টাকা লুঠ করে ফেলা হয়েছে মাঝপথে।

'সভ্য' মানুষদের কাছে এভাবে বহুযুগ ধরে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকার কারণে তাদের বুকে ক্রমশ জমেছে গ্যালন গ্যালন ক্রোধ। তারা জেনে গেছে তারা সমাজের 'অপাঙক্তেয় শ্রেণির মানুষ'। এখন কোনও আদিবাসী-দরদী মানুষ তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করলেও তারা আর বিশ্বাস করে না 'সভ্য' (বা দিকু) মানুষদের। আর ঠিক এই সুযোগটাই নিয়েছে মাওবাদীরা। তারা আদিবাসীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে তাদের এলাকার বাইরের 'সভ্য' মানুষরা প্রকৃতপক্ষে তাদের শত্রু। তাদের কবল থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে তাদের পক্ষে সসম্মানে জীবনযাপন করা অসম্ভব। সেই সঙ্গে মাওবাদীরা তাদের এলাকায় কিছু কাজের সুযোগ করে দিয়ে, ছোটো ছেলে-মেয়েদের অবৈতনিক টিউশন দিয়ে, বিনা পয়সায় কিছু ওষুধ সরবরাহ করে জয় করে নিতে পেরেছে আদিবাসীদের মন। অনেক জায়গায় সাফল্য পেয়েওছে তারা। যেখানে মন জয় করা যায়নি সেখানে কিছু যুবক-যুবতীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে অস্ত্রবলে দখল করা যায় সেইসব এলাকা। পরিস্থিতি ক্রমে এমন দাঁড়িয়েছে মাওবাদীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে খুন হয়ে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। খুন হচ্ছেও একের পর এক। ঠিক এরকম একটা গভীর সংকটের মোকাবিলা করতে প্রবেশ ঘটেছিল যৌথবাহিনীর।

ফলে আদিবাসীদের সামনে এখন দ্বিবিধ সমস্যা। মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মেলালে যৌথবাহিনীর কুনজরে পড়া, হাত না মেলালে মাওবাদীদের আক্রোশে পড়া। অর্থাৎ আদিবাসীরা আবর্তিত হচ্ছে এক গভীর সংকটে। তাঁদের বেশিরভাগ মানুষই জানেন না মাওবাদীদের সমর্থন করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা। মাওবাদীরা তাঁদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছে তাতে তারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণেই। যখন রাষ্ট্রের কাছে তাঁরা প্রার্থিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, বাইরের শক্তির কাছে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের তৃষাতুর হাত। কিন্তু এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র যখন তাঁদের কাছে সুবিধা দিতে প্রস্তুত, তখন তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে মাওবাদীরা। তা হলে আদিবাসীরা এখন কী করবেন!

প্রথমদিকে আদিবাসীরা খেয়াল করে দেখেননি এই মাওবাদীদের একটা বড়ো অংশ বাইরের লোক। তাদের অধিকাংশ আদিবাসীই নয়। তাদের একমাত্র ইচ্ছে এভাবে আদিবাসীদের ভোলাতে পারলে তারাই দখল করবে ক্ষমতা। তাতে সামান্য কিছু আদিবাসীর সুবিধা হলেও অধিকাংশ দরিদ্র আদিবাসীরা রয়ে যাবে সেই একই তিমিরে।

কিন্তু এই পরম সত্যটা তাদের কাছে পৌঁছে দেবে কে! যে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী এখন 'সভ্য' জগতের মানুষদের আর বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে পৌঁছানোই এক প্রায়-অসম্ভব কাজ। আদিবাসী নেতারাও তাঁদের নিজের কমিউনিটির কাছে হারিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতা। তাঁরা আদিবাসীদের বোঝাতে গেলে 'বেইমান' আখ্যায় ভূষিত হয়ে যে কোনও মুহূর্তে লাশ হয়ে যাবেন। কী অদ্ভুত বিবর্তন! এক আদিবাসী খুন করছে আর এক আদিবাসীকে!

একদা যারা ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, এক বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তারা অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয়ে গেল এক-একজন 'অপরাধী'তে!

কিন্তু এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ারই বা কী উপায়! যারা সত্যিই আদিবাসী-দরদি এমন মানুষের সংখ্যা কি নিতান্তই মুষ্টিমেয়! আমি আজও বিশ্বাস করি মানুষকে ভালোবাসাই তাদের জয় করার একমাত্র উপায়। আদিবাসী মানুষরা নিতান্তই গরিব। তাঁরা দুমুঠো খেতে পাওয়াকেই জীবনের বড়ো পাওয়া বলে মনে করেন। তাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তো ননই, বরং সহজ জীবনযাপনেই উদ্‌গ্রীব।

তাঁরা আসলে পাগলের মতো ভালোবাসেন তাঁদের কৃষ্টি, তাঁদের সংস্কৃতি, তাঁদের পরব-উৎসব। আধপেটা খেয়ে, কিংবা না-খেয়েও তাঁরা সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে নাচগান করে কাটিয়ে দিতে পারেন একটা গোটা রাত সেই দৃশ্য বহুবার আমার নিজের চোখে দেখা। তাঁদের সেই সংস্কৃতি কিন্তু আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। একবার অভিভূত হয়েছিলাম তাদের ঝিকা-নাচ দেখে। মেয়ে-বউরা পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে নাচে, আর এক অদ্ভুত সুরে গান গায়। ঝিকা-নাচের সময় তাদের প্রত্যেকের মাথায় বিড়ার উপর বসানো থাকে একটি জলভর্তি কলসি। নাচের সময় তারা একবার সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, একবার পিছনের দিকে, আর প্রতিবারই তাদের প্রত্যেকের মাথার কলসি থেকে সামনে বা পিছনে চলকে পড়ে কিছুটা করে জল, কিন্তু কোনও কলসিই মস্তকচ্যুত হবে না। এরকম আরও বহু আশ্চর্য-দৃশ্য আজও গেঁথে আছে মগজের মধ্যে। কিন্তু তাদের এই বর্ণময় সংস্কৃতির এখন কী দশা! বিশিষ্ট গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে কিছুদিন আগে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি সাঁওতাল আকাদেমিতে অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে না পেরে বাধ্য হয়েছিলেন পদত্যাগ করতে।

আদিবাসী মানুষদের ক্ষোভ এরকম বহু কারণেই। তাদের যদি মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হয় তাদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের আদত সংস্কৃতিও। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি রক্ষাই হবে তাদের কাছে বাঁচার রসদ জোগান দেওয়া, তাদের আবার আগের মতো প্রাণবন্ত করে তোলা।

আসলে আদিবাসী মানেই তারা নিরক্ষর, তাদের মেধায় ঘাটতি আছে, তারা ঠিক আমাদের মতো নয়— এরকম কিছু ভ্রান্ত ধারণা থেকেই আমরা তাদের সরিয়ে রাখি মূল স্রোত থেকে। কিন্তু এরকমটা ভাবার কোনও কারণ ঘটে না যদি তাদের সম্পর্কে কিছু খবরাখবর রাখা যায়। আমরা কি জানি কী অফুরান তাদের প্রাণপ্রাচুর্য! একটি আদিবাসী মেয়ে বা বউ যদি সারাদিন একটি দানাও দাঁতে না কাটে, উপোসী পেটেও তারা হাসিমুখে নাচগান করে কাটিয়ে দিতে পারে একটা গোটা রাত! কোনও বর্ণহিন্দু ঘরে মেয়ে তা কি চিন্তাতেও আনতে পারবে! তারা তো গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে ঘরের কোণে, আর দোষারোপ করবে তাদের দুর্ভাগ্যকে।

অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সেই মানুষগুলি কী অসম্ভব ভালোবাসা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করে তাদের সংস্কৃতিমনস্ক জীবনযাপন! সেই সংস্কৃতির কতটা খবর আমরা রাখি!

কিংবা আমরা কি জানি তারা তাদের সাধারণ মাটির ঘরগুলিকেও কী নিখুঁত জ্যামিতি দিয়ে গড়ে তুলে তাতে রং দিয়ে করে তোলে আকর্ষণীয়! একজন অন্য সম্প্রদায়ের মাটির বাড়ি আর একজন আদিবাসীর মাটির বাড়ি পাশাপাশি দেখলেই স্পষ্ট হতে পারে বিষয়টি। তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হোক, তাদের শিল্পবোধ আমাদের দিতে পারত কিছু ভাস্কর বা চিত্রশিল্পী। কিংবা তাদের শিল্পবোধকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করা যেত অন্য কিছু।

অথবা আমরা কি জানি তাদের ভাষা কী অসম্ভব সমৃদ্ধ! তাদের কোনও একটি অভিধান খুললেই উপলব্ধি করা যাবে কী বিপুল শব্দসম্ভার ব্যবহৃত হয় তাদের ভাষায়! আমরা কি এও জানি তাদের ভাষায় ব্যাকরণ অনায়াসেই তুলনীয় সংস্কৃত বা ফরাসি ব্যাকরণের সঙ্গে! তাদের ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য, ক্রিয়ার কাল ইত্যাদি অনুসরণ করলে বিস্মিত হতে হয় এরকম সমৃদ্ধ ভাষা বিষয়ে আমরা তেমন খবর রাখি না কেন! তাদের গানগুলির অর্থ অনুধাবন করলেও তো উপলব্ধি করা যায় তাদের চিন্তাশক্তির কী গভীরতা।

আসলে অনাদিকাল থেকে তাদের আমরা কম-মেধাসম্পন্ন মনে করি বলেই তাদের সম্পর্কে আমাদের এই অনীহা! তাদের মেধাকে যদি আমরা অন্যভাবে গুরুত্ব দিই তা হলে হয়তো তাদের জীবনটাই বদলে যেত এতদিন! তবে অনেকটা দেরি হয়ে গেলেও এখনও চেষ্টা করলে হয়তো মেরামত করা যায় তাদের জীবনের গভীর ক্ষত।

আমরা তাদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারি। তাদের সংস্কৃতিকে আরও ঋদ্ধ করে তুলে তা কি আমরা নিয়মিত তুলে ধরতে পারি না বাইরের জগতের মানুষদের কাছে। মাঝে একবার পরিকল্পনা হয়েওছিল ঝাড়গ্রামে একটি উন্মুক্ত স্থায়ী মঞ্চ গড়ে তুলে সেখানে নিয়মিত পরিবেশিত হবে আদিবাসী নৃত্যগীত। পর্যটকদের আকর্ষণ করতে তা হবে এক অদম্য আকর্ষণ।

সমৃদ্ধতর করা যায় তাদের ভাষা, তাদের সাহিত্য, তাদের শিল্প।

কিন্তু সেই কাজের জন্য চাই কিছু আদিবাসী-দরদি মানুষ, কিছু সৎ রাজনৈতিক নেতা ও কিছু শ্রদ্ধেয় আদিবাসী মানুষ। তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এখনই শুরু করা যেতে পারে আদিবাসীদের মন জয় করার কাজ। এই মুহূর্তে খুবই কঠিন, কিন্তু কোনও দীর্ঘ প্রচেষ্টার শুরু তো করতেই হয় একদিন।